আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শাশুড়িমাতা শ্রীমতী
পুতুল রায়কে

ভূমিকা

জীবনের বড়ো বিচিত্র গতি। কখনও সোজা পথে চলে, আবার কখনও বাঁকা পথে, ঠিক নদীর মতো। আর এই চলমান পথেই তৈরি হয় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কত উপাখ্যান! তাদেরই পাথেয় করে তৈরি হয় নতুন নতুন গল্প উপন্যাস। সেইসব চলমান মানুষের জীবন ছবি নিয়েই আসছে আমার দু'টি উপন্যাস 'গড় ব্রহ্মপুরের পদাবলী' ও 'স্বপ্নসরণি'। দুটি উপন্যাসই সামাজিক পটভূমিকায় সহজ সরল ভাষায় এমন কিছু মানুষের জীবন কাহিনি নিয়ে লেখা যাঁরা সাধারণ হয়েও অসাধারণ। তাঁদের জীবনে সম্পর্কের টানাপোড়েন, লুকিয়ে থাকা ব্যথা-বেদনা-আনন্দ, ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা– এসব কিছুই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি আমার লেখায়। জানি না কতটা সার্থক রূপদান করতে পেরেছি আমার লেখায়; জীবনের গল্প শেষ হয় না। চিরন্তন শাশ্বত অঙ্গীকারে এগিয়ে চলে। এই দুটি উপন্যাস এক মলাটে এনে একটা বই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এল এফ বুকস—পাঠকের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। পাঠকই শেষ কথা বলেন। তাঁর লেখা পাঠক মনে দাগ কাটবে, এই আশা তো সব লেখকই করেন। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমার লেখা আপনাদের পরিতৃপ্ত করলেই সব শ্রম চরিতার্থতা পাবে। ধন্যবাদান্তে

দিনহাটা, কোচবিহার
১৫.০৫.২০২৫

সুজিত বসাক

স্বপ্নসরণি ১১
গড় ব্রহ্মপুরের পদাবলী ৫৩

স্বপ্নসরণি

আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা একটা করে তারা গুনছিল শতরূপা। এক... দুই...তিন...চার...পাঁচ...তারপরেই খেই হারিয়ে ফেলল। শুধু শুরুর তারাটাকে চিনতে পারল, বাকিরা মিলেমিশে একাকার। মনটা ছুটছে আজ পাগলের মতো। এই মন নিয়ে তারা ধরা যায় না। বৃথাই চেষ্টা! একটু বাদে একখণ্ড কালো মেঘ তারাগুলোকে মুছে দিয়ে গেল। বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠল শতরূপার। ধরা যায় না অনেক কিছুই, তবু ধরার আকাঙ্ক্ষাটা যতক্ষণ মন জুড়ে থাকে, বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন হয়ে ওঠে। এতক্ষণ তারাগুলো ছিল, জীবনের অলি-গলি দিয়ে একটা জীবনপ্রবাহ চলছিল যেন। এখন সব অন্ধকার। একপোঁচ কালি মেরে দিয়েছে আকাশের বুকে। আকাশ জুড়ে আকাশের স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে ভীষণ অসহায় লাগল শতরূপার। এবার? জীবনের এক একটা মোড় এমন আসে, সব কিছু দুমড়ে মুচড়ে পিষে ফেলতে চায়। একেই কি বলে নিয়তি? বড়োদের মুখে বহুবার শুনেছে কথাটা, কিন্তু তেমনভাবে আমল দেয়নি কখনও। আজ মনে হল, জীবনই কোনোভাবে না কোনোভাবে মানুষকে জীবনের শিক্ষা দিয়ে দেয়। কিন্তু এত কঠোর শিক্ষা!

শতরূপা একটি স্কুলের দিদিমণি। স্কুলটা ভালো, সবদিক থেকে নামডাক আছে। আজকাল স্কুলের চাকরির মাইনেও ভালো। শতরূপাকে খুব সুশ্রী না বললেও, কুৎসিত বলা চলে না। গায়ের রং একটু চাপা, বড়ো বড়ো চোখ, ঘাড়ের কাছে খোঁপা। সব মিলিয়ে চেহারার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে; যা কিছু লোককে যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনি অবাঞ্ছিত কিছু লোককে দূরে সরিয়ে রাখতেও সাহায্য করে। শতরূপা লোকের সঙ্গে কথাও বলে একটু কম। অনেকেই সেটাকে দেমাক ভাবে—জানে সে। আসলে সেটা যে তার একটা কমতি, তারা বোঝে না। ছোটোবেলা থেকেই শতরূপার মুখচোরা স্বভাব। এখন তো তবু একরকম, আগে সে বেশি লোক দেখলেই ঘাবড়ে

যেত, বাড়ির কোনও কোনায় লুকিয়ে থাকত। তারপর লোকজন চলে গেলে বেরিয়ে আসত। এই নিয়ে বাড়িতে হাসাহাসিও কম হত না। শতরূপার একমাত্র বন্ধু ছিল বই। সেটা অবশ্য এখনও আছে। বই পড়তে সে ভীষণ ভালোবাসে। তার নিজস্ব জগৎ বলতে ওটাই।

অম্বরীশের সঙ্গে শতরূপার বিয়েটা সম্বন্ধ করেই হয়। অম্বরীশ সরকারি অফিসের বড়ো চাকুরে। প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়েছিল ওদের। দেনাপাওনা নিয়ে বাধেনি। শতরূপার তখন চাকরির এক বৎসরও হয়নি, বাবাও রিটায়ার করলেন ঐ বছর; তবু যথাসাধ্য ধুমধাম করে বিয়ে হল শতরূপার। শতরূপার নিজেরই আপত্তি ছিল এসবে। আড়ালে ডেকে বাবাকে একদিন বলেছিল, "এতকিছু করছ কেন? সঞ্জু, সোনা, ওদের কথা মাথায় আছে তোমার?"

বাবা হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "তুই আমার বড়ো মেয়ে। তোর জন্যে এটুকু করতে পারব না? ওদের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া তুই তো আছিস। আমার ছেলে না থাকুক, তোরাই বা কম কীসে?"

বাবা কোনোদিন মেয়ে বলে ওদের নেগলেক্ট করেননি, বরং সব জায়গাতেই গর্বের সঙ্গে ওদের পরিচয় দিয়েছেন। শতরূপার বিয়ের এক বছর পার হতে না হতেই সঞ্জুরও বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পড়াশুনায় তেমন ভালো না হলেও সঞ্জু দেখতে বেশ সুন্দরী। পাত্র সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকায় থাকে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করে। কিন্তু ছেলে দেখতে তেমন সুবিধার নয়। সেজন্যই হয়তো ওদের সুন্দরী পাত্রীর চাহিদা ছিল। সেকথা অবশ্য স্বীকারও করেছে ওরা। শতরূপার বাবার একটু আপত্তি ছিল। শতরূপারও। যেহেতু সম্বন্ধটা অম্বরীশ এনেছিল তাই সে কিছু বলতে সাহস পায়নি। শেষ পর্যন্ত মা আর অম্বরীশের মতেই বিয়েটা হয়ে গেল। তবু শতরূপা একদিন লুকিয়ে সঞ্জুকে বলেছিল, "কী রে, তোর মত আছে তো?"

সঞ্জুটা আগাগোড়াই একটু ড্যালভেলে আর লোভী টাইপের। নিজস্ব বোধবুদ্ধি কম। অম্বরীশের মগজ ধোলাই কতটা ওর উপরে এফেক্ট হয়েছে বুঝতে পারল শতরূপা। বিয়ে হয়ে গেল সঞ্জুর। শুর স্বামী কয়েকমাস পরেই ওকে নিয়ে চলে গেল আমেরিকা। বহু দূরের স্বপ্নের শহর নিউ ইয়র্কে। সেই স্বপ্নের দেশে সঞ্জু কেমন আছে মাঝে মাঝে ফোন করে জানায়। ও ভালো আছে জেনে খুশি হয় সবাই।

হঠাৎ করেই এক রাতে বাবার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হল। এমনিতেই তাঁর শরীরটা ভালো ছিল না। কোনোরকমে মনের জোরে চলছিলেন। এমনই

অবস্থা সেই সময়টাতে অম্বরীশও শহরে নেই। শতরূপা শোনামাত্র তোতনদার মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে নার্সিংহোমে অ্যাডমিট করিয়েছিল। আই. সি. ইউ-তে কয়েক ঘণ্টা থাকার পর সব শেষ।

এতদিন ঠিক ছিল, এরপর অম্বরীশের মধ্যেকার আর একটা রূপ দেখতে পেল শতরূপা। বাবার মৃত্যুর পর শতরূপা জানতে পারল, বাবার সঞ্চয় বলতে আসলে কিছুই নেই। যা ছিল, দু'মেয়ের বিয়েতে তার সবটাই চলে গিয়েছে। খুব সাধারণ মানের একটা চাকরি করতেন। খেয়ে-পরে, সব দায়-দায়িত্ব পালন করে কতটুকুই বা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন? মা আর সোনাটার জন্য চিন্তা হল শতরূপার। সেই সঙ্গে এটাও মনে হল, এই বিপদের সময়ে ওদের পাশে দাঁড়ানোটা ওর দায়িত্ব। আজ যদি ওদের কোনও ভাই থাকত তাহলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু অম্বরীশকে কিছু না জানিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না ভেবে একদিন সুযোগ বুঝে কথাটা পাড়ল, "একটা কথা বলার ছিল। মানে একটা পরামর্শ চাই তোমার..."

অম্বরীশ চোখ না তুলেই জবাব দিয়েছিল, "কীসের আবার পরামর্শ? ভণিতা না করে পরিষ্কার করে বলো..."

"বলছিলাম আমাদের বাড়ির অবস্থাটা তো তুমি সবই জানো। এই বাজারে মা পেনশানের যে টাকাটা পাবে তা দিয়ে চলা মুশকিল। সোনাটা বড়ো হয়েছে, একটা মেয়েমানুষের কত কিছু লাগে। সায়েন্স নিয়ে ইলেভেনে ভর্তি হয়েছে। বইপত্র, টিউশন সব মিলিয়ে অনেক খরচ। তাই বলছিলাম এই সময়টাতে আমি যদি ওদের কিছু টাকাপয়সা দিয়ে হেল্প করতে চাই, তোমার আপত্তি আছে?"

অম্বরীশের কাঠখোট্টা প্রশ্ন, "কত টাকা দিতে চাও?"

"প্রতি মাসে হাজার দশেক করে...আমি তেমনটাই ভেবেছি।"

"কী যা তা বলছ! অত টাকার কী দরকার ওদের? হেল্প করতে চাও ভালো কথা। কিন্তু দু'হাজার টাকার বেশি দিতে পারবে না। তোমার ভরসায় আমি নতুন ফ্ল্যাটটা কিনলাম। তার ই এম আই কে দেবে?"

এক নিমেষে একটা জগৎ খান খান হয়ে গেল যেন। হতবাক হয়ে গেল শতরূপা। মন তোলপাড় করা একটা সুনামি চলল বহু সময় ধরে। যখন সম্বিত ফিরল, দেখল অমোঘ বাক্যটি শুনিয়ে দিয়ে অম্বরীশ ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগেই। নিজেকে কেমন ছোটো লাগল শতরূপার। সংসারে তার মূল্য তাহলে এই! কিছু কিছু রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর জ্বালা ছাড়া কিছুই

মেলে না। শতরূপা কোনোদিন কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। ওর ধাতে সয় না। খুব রাগ হলে গুম মেরে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু আজ আর নিজেকে সামাল দিতে পারল না। অম্বরীশ বাইরের ঘরটায় কমপিউটারের সামনে বসে একমনে কী যেন দেখছিল। চাকরি আর শেয়ার ছাড়া কিছুই বোঝে না লোকটা। নির্ঘাত শেয়ার সংক্রান্ত কিছু হবে। রাগে গা-পিত্তি জ্বলে উঠল শতরূপার। ঝাঁঝালো গলায় বলল, "নতুন ফ্ল্যাট কেনার সময় তুমি আমার মতামতের তোয়াক্কা করোনি। আমার অমত ছিল। তার ই এম আই আমি দেব কেন?"ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অম্বরীশ। মুখে একটা তাচ্ছিলের ভাব। যেন বলতে চায়, মেয়েমানুষের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে সে চায় না। উত্তর না পেয়ে আরও ক্ষেপে গেল শতরূপা। প্রায় চিৎকার করে বলল, "চাকরিটা আমি করি, তুমি নও। তোমার টাকা নিয়ে আমি তো কোনোদিন কথা বলিনি। তাছাড়া আমার মাইনের পুরোটাই তো এতদিন তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আজ আমার প্রয়োজন, আমি চাইতে পারব না? আশ্চর্য!"

"শাট আপ।" চিৎকার করে উঠল অম্বরীশ, "তোমার প্রয়োজন নয় এটা। তোমার বাপের বাড়ি এখন তোমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। ওদের ব্যবস্থা ওরা ঠিক করে নিতে পারবে, তোমাকে নাক গলাতে হবে না।"

"তার মানে তুমি দিতে দেবে না?"

"না। দ্যাখো অযথা অশান্তি বাড়িও না, যা বলছি তাই শোনো। আমি কি আমার জন্যে টাকা জমাচ্ছি, ফ্ল্যাট কিনছি?"

"আমাদের তো কম নেই। বাড়িঘর সব আছে। দুজনে চাকরি করছি, আর কী চাই?"

"তোমাকে অত কৈফিয়ত দিতে পারব না। তোমাকে যেটা বলেছি সেটাই করতে হবে।"

"নইলে..."

"ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। আমাদের বংশটাকে তো ভালো করেই চেনো। বাপ-ঠাকুরদা কেউ কখনও বউদের দাসত্ব করেনি। শুনেছি আমার ঠাকুদার বাবা নাকি মুখের ওপর কথা বলার জন্য তাঁর বউকে এমন জুতোপেটা করেছিলেন যে সামনের দুটো দাঁত নড়ে গিয়েছিল। আমার মাকে দেখে তো বুঝতেই পারো বাবার দাপট।"

"তা তো দেখছি এই পাঁচ বছর ধরে। বউকে মেরেধরে যারা দাপট দেখায় তারা কাপুরুষ। এতদিন তোমাকে একটু উন্নত ভাবতাম, আজ থেকে সে

ধারণাটাও পালটে গেল। তোমাকে আমার দাসত্ব করতে কিন্তু বলিনি আমি। মায়ের দিকটা একটু দেখতে বলেছিলাম। তোমার ওপর কত ভরসা করে ওরা। তুমি না হয় কিছু নাই করলে, আমি করলে তোমার আপত্তি কোথায়?"

"হবে না। ব্যস। এ বিষয়ে আমি আর একটা কথাও বলতে চাই না।"

"আমি তোমার কেনা সম্পত্তি নই। আজ বুঝতে পারছি তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে স্রেফ টাকার লোভে।"

"অতই যখন বোঝ তখন চুপ করে যা বলছি সেটা মেনে চললেই তো হয়।"

"পারব না। আমি তোমার মায়ের মতো অসহায় নই। কালকেই তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।"

বিকৃত হাসি হাসল অম্বরীশ, "যাও যাও, দু'দিন থেকে আবার সুড়সুড় করে ফিরে আসতে হবে। অনেক দেখা আছে।"

পরের দিন সকালেই বাপের বাড়ি চলে এল শতরূপা। এতবড়ো একটা সিদ্ধান্ত সে নিতে পারল, সেটা ভেবে সে নিজেই অবাক হল। এমন করে তো কোনোদিন ঝগড়াও করেনি সে, সেটাও পারল! তার ভিতরে যে আর একটা প্রতিবাদী চরিত্র ছিল সেটাকেও প্রথম আবিষ্কার করল সে। এতকাল একই ছাদের তলায় এমন একটা অর্থলোলুপ মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে সে ভুলেই গিয়েছিল তার নিজস্ব নারীসত্তাকে। ছোটো ছোটো ঘটনা, এই সংসারে অনেক শিক্ষা দিয়ে যায়। এমন না হলে অম্বরীশকে সেভাবে তো জানাই হত না। এসব ভালো হল কী মন্দ হল জানে না শতরূপা। আসন্ন বিপদটার পরিচয় তার জানা নেই। তবু মনের মধ্যে সঞ্চারিত বিদ্রোহটা জ্বালামুখী হয়ে শক্তির উৎস হচ্ছে বুঝতে পারল শতরূপা। কিছুতেই হারবে না সে। কেন হারবে সে? স্নেহশীল, প্রেমিক পুরুষের কাছে সে মাথা নোয়াতে পারে, কিন্তু উদ্ধত, স্বার্থপর, বিবেকহীন মানুষের কাছে কেন? একটা জীবন কোনোভাবে ঠিক কেটে যাবে। সামর্থ্য, অবলম্বন দুটোই তো তার আছে। ছোট্ট তিন্নিকে সে ঠিক মানুষ করে তুলতে পারবে। একাই।

"অ্যাই বড়দি, তোকে মা ডাকছে তো নীচে। তাড়াতাড়ি নেমে আয়।"

সোনার ডাকে হুঁশ ফিরল শতরূপার। এতক্ষণ ছাদের উপর বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। সেই সন্ধেবেলা উঠেছিল, এখন তো মনে হচ্ছে অনেকটা রাত। তার মানে অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। সোনা দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দরজার মুখটার কাছে। দিদির উত্তরের অপেক্ষায়। শতরূপা বলল,

"তুই যা, আমি আসছি, ক'টা বাজল রে?"

"সাড়ে সাতটা।" সোনা বলল।

"তিন্নি কী করছে?"

"একটু আগে ঘুম থেকে উঠল। মা খাইয়ে দিচ্ছে।"

"তোর আজ প্রাইভেট টিউশন নেই?"

"ছিল তো। কেমিস্ট্রি। পড়ে এলাম। মা তোকে ডাকতে বলল, চা খাওয়ার জন্য।"

বিয়ের আগে থেকেই ওদের বাড়ির ছাদটা ভীষণ প্রিয় ছিল শতরূপার। রোজ বিকেলে এখানে উঠে আসতো নিজের মতো করে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামত, তারপর অদ্ভুত একটা ঘোর নিয়ে গুটি গুটি পায়ে নীচে নেমে যেত। উচ্ছ্বাস আর বিষণ্ণতা, দুইয়ে মিলে ছাদের উপর গড়ে উঠত তার নিজস্ব একটা জগৎ, যেখানে সে নিজে নিজেই হাসত, খেলত, ভবিষ্যৎ জীবনের কত স্বপ্ন বুনত। অনেকদিন পর আবার সেই অনুভূতিটা পেল শতরূপা। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল। নিজের হাতে বোনা টগর গাছটাকে খুলে বলল মনের দুঃখের কথা।

মায়ের কাছে কিছুই লুকোতে পারল না শতরূপা। লুকোনোর প্রশ্নও ছিল না। শুধু একটু সময় নিয়েছিল সে। মা না জিজ্ঞাসা করলে নিজেই বলত সব। পাশের ঘরে সোনা তিন্নির সঙ্গে খেলায় মত্ত। খেলে-টেলে ও হয়তো পড়তে বসবে। এই সুযোগে মা বলল, "কী রে রূপা, কিছু হয়েছে নাকি রে? এবার তোর আসাটা কেমন জানি ভালো লাগছে না। এসে থেকেই মনমরা হয়ে আছিস, মুখে হাসিটি পর্যন্ত নেই, কী হয়েছে রে? অম্বরীশের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?"

শতরূপা গম্ভীর মুখে বলল, "হ্যাঁ। সত্যটা তোমারও জানা দরকার। তুমি জিগ্যেস না করলে আমিই তোমাকে সব বলতাম।"

ধীরে ধীরে শতরূপা মাকে সবটাই খুলে বলল। সব শুনে মা নিভাদেবীর বুকটা কেঁপে উঠল। বললেন, "এ কী সর্বনেশে কথা বলছিস তুই রূপা? তোর কি মাথাটাথা ঠিক আছে? ওরা পুরুষ মানুষ, রাগের মাথায় দুটো কড়া কথা শোনাতে পারে। তার জন্য কেউ স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসে? না মা, এটা তুই ঠিক কাজ করিসনি। সারা জীবন তুই এভাবে কাটাতে পারবি? তাছাড়া ছোট্ট মেয়েটার কথা ভাববি না?"

শতরূপার চোয়াল শক্ত, মাথাটা নীচু। এটা যেন প্রত্যাশিত ছিল তার কাছে।

নিভাদেবী বলেই চলেছেন, "তোর মাইনের টাকার ওপর অম্বরীশের অধিকারটাই তো আগে। সে যেমনটা বলবে তোকে তেমনটাই করতে হবে। আমাদের নিয়ে তোকে অত ভাবতে হবে না। আমাদের একরকম ঠিক চলে যাবে। বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর ঘরই আপনঘর।"

সংসারের একটা সীমানা থাকে। আর সেই সীমানা পেরিয়ে নতুন জগতে প্রবেশ অত সহজ কাজ নয়। এখানে প্রতিবাদ চলে না। বিশেষ করে মেয়েদের। আগে এসব নিয়ে ভাববার কোনও অবকাশ ছিল না শতরূপার। জীবন তার নিজস্ব গতিতে চলছিল। সামান্য একটা হোঁচট, অনেক কিছুই এলেমেলো করে ছিল। একটা অদম্য, অস্বাভাবিক জেদ যে তার মতো সাধারণ আটপৌরে মেয়ের মধ্যেই ছিল কোনোদিন টের পায়নি। কোনও বুঝ দিয়েই তাকে বোঝাতে পারছে না শতরূপা।

নিভাদেবী তখনও সচল, "একটু ঠান্ডা মাথায় ভাব তাহলেই সব বুঝতে পারবি। তুই তো আমার অমন মাথা গরম করা মেয়ে নোস, হঠাৎ কী হল? এত মাথা গরম হল কেন? দ্যাখ, জীবনটা অনেক বড়ো, এতবড়ো একটা জীবন মেয়েরা অবলম্বনহীনভাবে কাটাতে পারে না। মেয়েদের অনেক সমস্যা। ঘুরে ফিরে আমাদের পথটা ওখানেই শেষ হয়।"

হঠাৎ মাথাটা উঁচু করল শতরূপা। মায়ের চোখে চোখ রেখে বলল, "আজ যদি অম্বরীশ মরে যেত? তাহলে কী হত মা?"

চুপসে গেলেন নিভাদেবী। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে। শতরূপা বুঝল, তার এই রূপ মায়ের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। ছোটো থেকে যে মেয়েটা চুপচাপ, কোনও ঝুট-ঝামেলার ধারে-কাছে থাকে না, বইয়ের পাতায় গড়ে তোলা নিজের জগৎ নিয়ে মত্ত থাকা মেয়েটার আজ কী হল? শতরূপা দৃঢ় গলায় বলল, "শেষটা তোমাকে তো বলাই হয়নি। এই অবাধ্যতার শাস্তি হিসাবে ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে। আর একটু হলে খাটের কোনাটা বিশ্রীভাবে আমার পেটে লাগতে পারত। তুমি কি মনে করো, এই পুরুষ কোনও মেয়ের অবলম্বন হতে পারে?"

নিভাদেবী বিড়বিড় করে বললেন, "অম্বরীশ এসব করেছে? ও তো এমন..."

বিদ্রূপের হাসি হাসল শতরূপা, "ছিল না, তাই তো? আমরা কেউ চিনতে পারিনি। মানুষ চেনা অত সহজ কাজ নয়। সারা জীবন একসঙ্গে থেকেও

অনেক মানুষকে চেনা যায় না। টাকার ব্যাপারটা উঠে না এলে হয়তো ওকে আমিও কোনোদিন চিনতে পারতাম না। যে লোকটা নির্দ্বিধায় বলতে পারে বউ পেটানো আমাদের বংশগত ঐতিহ্য, তাকে তুমি মানুষ বলবে? আমার চাওয়াটা খুব অল্প মা, কিন্তু চাওয়ার মধ্যে কোনও জানোয়ারের স্থান নেই।"

নিভাদেবী ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বললেন, "এবার কী হবে বল তো? আমার হাত পা কাঁপছে। আমি মেয়েমানুষ, তোকে নিয়ে এবার কী করব বল তো? তোর বাবা বেঁচে থাকলে তবু কথা ছিল।"

শতরূপা হাসল। ওর মা আগাগোড়াই ভিতু প্রকৃতির মহিলা। সামান্য কিছুতেই দিশেহারা হয়ে যায়। বাবা কীভাবে যে মাকে সামলাত তা তো বহুবার দেখেছে শতরূপা। শতরূপা বলল, "অত ভয় কেন? কই আমি তো অত ভয় পাচ্ছি না। বাবা নেই, আমরা কি মরে গেছি? এই পৃথিবীতে কেউ অপরিহার্য নয়। এরকম শূন্যতা সবার জীবনেই আসে। আর সেই শূন্যতার জুজু দেখিয়ে কেউ অন্যায় অত্যাচার চালিয়ে যাবে সেটা হতে পারে না। তবে তুমি যদি মনে করো, আমি এখানে থাকলে তোমার অসুবিধা হবে, তাহলে আমি বাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।"

"কী যা তা বলছিস? আমি কী তাই বলেছি? মেয়ের ঘর ভাঙছে দেখলে কোন মায়ের না বুক কাঁপে বল?"

শতরূপা মায়ের গা ঘেঁষে বসল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "এমন ঘরের মোহ আর আমার নেই মা। ওর থেকে আলাদা থাকলে আমি অনেক ভালো থাকব। তুমি এ নিয়ে আর বেশি ভেবো না।"

"কী জানি বাপু, আমার মাথা আর কাজ করছে না।"

রাতে বিছানায় পড়ে থাকাটাই সার হল, ঘুম এলো না শতরূপার চোখে। মাথার মধ্যে চিন্তার পাহাড়। একটু একা পেলেই সেগুলো চেপে বসে আরও ভয়ানকভাবে। যতই হোক, পারিপার্শ্বিক দ্বিধাদ্বন্দ্বগুলো মনের মধ্যে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে দুর্বল করে দিতে চায়। নারীর উদ্ধত মাথা- সে তো পুরুষশাসিত সমাজে বেয়াদপি। এরপর আশেপাশে শুরু হবে কানাঘুষো। "বুঝলি নেপু। বোস বাড়ির বড়ো মেয়েটা স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছে।" নেপু বলবে, "সব চরিত্তির দোষ গো, কালে কালে কতই তো দেখব।" আসলে মেনে চলাটার নামই সুখ। না মানলেই দুঃখ। আবহমান কাল থেকে চলে আসা এই সুখের মাঝে নারী পুতুল মাত্র। সত্যিকারের সুখ সে কতটা পায় তা সে নিজেও জানে না। তবু তাকে সুখী হতে হয়। এটাই যে নিয়ম!

ভোরের দিকে, শরীর-মন দাপিয়ে বেড়ানো ক্লান্তিটা আশ্রয় নেয় ঘুমের কোলে। সমস্ত স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে। কিন্তু ঘুম ভেঙে যায় খুব সকালে। কে যেন সদর দরজায় কড়া নাড়ছে। মা কি ওঠেনি এখনও? অবশ পায়ে শতরূপা এগিয়ে যায় সদর দরজার দিকে। কে কড়া নাড়ছে এত অধৈর্যভাবে? আরে বাবা আসছি, আসছি। দরজা খুলতেই ভীষণ ভীষণ অবাক হয়ে যায় শতরূপা। এ কাকে দেখছে সে? নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হল তার।

দুই

ক'দিন থেকেই একটা রহস্য দানা বাঁধছে নভোনীলের মনে। সঞ্জয় তাকে কিছু একটা লুকিয়ে যাচ্ছে। কী এমন ব্যাপার যে সঞ্জয় তাকেও বলতে চায় না? সঞ্জয় তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, তবু এমন করছে কেন? এমনটি কখনও করেনি সঞ্জয়। করতে পারে সেটাও ভাবতে পারে না নভোনীল। দুই বন্ধুর মাঝে এই গোপনীয়তা কেমন করে বাসা বাঁধল কে জানে। ইদানীং সঞ্জয় কেমন জানি অন্যমনস্ক থাকে। ওদের পারিবারিক একটা অশান্তি চলছে সেটা ভালো করেই জানে নভোনীল। কিন্তু সেটার জন্য কখনোই সঞ্জয়কে তেমন চিন্তিত দেখায়নি। হঠাৎ করে সেটাই কি গ্রাস করল ওকে? ছেলেটার ভাগ্যটাই খারাপ। বেশ চলছিল সবকিছু, বাবা হঠাৎ করে একটা বাস অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেতেই সবকিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। কাকাদের সঙ্গে যৌথ ব্যবসা ছিল ওদের। সঞ্জয়ের বাবাই সামলাত সবকিছু। তবু সে মারা যাওয়ার পর কাকারাই হয়ে উঠল সর্বেসর্বা। সঞ্জয়ের মা, দিদি ওসব কিছুই বোঝে না, সঞ্জয়ও নাবালক; সবমিলিয়ে ওরা সুযোগটা হাতছাড়া করল না। ব্যবসা থেকে কিছুই পেল না সঞ্জয়রা। থাকার মধ্যে রইল শুধু বাড়ির একটা অংশ। ছোট্ট ছোট্ট দুটো ঘর, কলপাড়, অন্ধকার বাথরুম আর এক চিলতে উঠোন। বাবা থাকতে দিদির বিয়েটা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। বাবার অকালমৃত্যুতে সেটা ভেস্তে গেল। সঞ্জয়ের মা কাকাদের কাছে অনেক আকুতি-মিনতি করেছিল। কিন্তু মন গলেনি তাদের। যে পাত্রপক্ষের প্রথম দিকে এত উৎসাহ ছিল, কোনও অজানা কারণে তারা আর একবারের জন্যেও দেখা করল না। কোনও খোঁজও নিল না। সঞ্জয়ের মা তারপর থেকে কেমন জানি হয়ে গেল। কেউ বাড়িতে এলেই বলে, "দেখো তো আমার মেয়েটার জন্যে একটা পাত্র।" এমনকি নভোনীলকেও মাঝে মাঝে বলে বসে। লজ্জা, বেদনা, হতাশা—